

“বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের লেখা- ঘরে-বাইরে উপন্যাসের স্বদেশিকতা”

Palan Saha

Research Scholar ,RTU, Hojai

সারসংক্ষেপ

বাংলা কথাসাহিত্যে অনেক উপন্যাসিকের উপন্যাস রয়েছে রাজনৈতিক ইতিহাসের ছত্রছায়া। সেখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ প্রথমা এই আনন্দমঠ হতেই দেশাত্মবোধক বা স্বদেশীকতার শুরু। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতীনাথ ভাদুরি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশীকতার আরো দৃষ্টান্ত ‘জীবনস্মৃতি’তে-

”বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয় তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।”

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশীকতার বীজ মন্ত্র আরো স্পষ্টরূপে দেখা যায় বিশ শতকের প্রথম পর্বেই উপস্থাপন করেছেন তার লেখা ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটিতে তিনজন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র রয়েছে। তবে সেই তিনজনের স্বদেশিকতা ভিন্ন আর নিখিলেশের স্বদেশিকতা নিষ্ক্রিয় ও নিস্প্রভ। সে শুধু যবনিকার অন্তরালেই ছিল কি? না তাকে উৎসাহিত করেছে বাল্যশিক্ষক চন্দ্রনাথ বাবুর মধ্য দিয়ে স্বদেশীকতার যে আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শের মিলও সুস্পষ্ট ছিল। তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখান থেকে। অন্যদিকে সন্দীপ ছিল মূল কাভারী এবং তার পথে বিমলা ছিল বাহক।

সূচক শব্দ- স্বদেশীকতা, উপন্যাস, বিশ শতক, রাজনৈতিক, মতাদর্শ, ব্যক্তি, স্বতন্ত্র, কাভারী ইত্যাদি।

স্বদেশীকতা ও রেনেসাঁ - ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস। ১৩ এই শতাব্দী ভারতীয় ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। এই শতাব্দীতে নবজাগরণ হওয়াতে জীবনের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং নতুন নতুন ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এখন এই অধ্যায়ে দুটি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। প্রথমত, নবজাগরণ বলতে কি বুঝায় এবং প্রতীচ্যের নবজাগরণের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় কোনদিকে; দ্বিতীয়ত, বাংলা তথা

ভারতীয় নবজাগরণের পিছনে বাঙালির দান কতটুকু এবং কোথায়। বাঙালি চিত্তের যে নবঅভ্যুদয় সাধিত হয়েছিল এই শতকে তা বাঙালির সাহিত্যে কতটুকু পর্যবসিত হয়েছে তার আলোচনাও আমার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা যদি ১৮০০ সাল থেকে ধরা হয় তাহলে সেই নবজাগরণ ৮৫ বছর স্থায়ী ছিল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই ৮৫ বছরব্যাপী বাঙালির জীবন সাধনার কাল উত্তীর্ণ হয়। তারপরের কাল সেই সাধনা, সেই আরাধনার সিদ্ধিলাভের কাল।

নবজাগরণ বা নবজাগরিত শব্দটি বাংলাদেশে কেশবচন্দ্র সেনই প্রথম ব্যবহার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়কে বলেছেন ‘পুনর্জন্ম’। ইংরেজি রেনেসাঁস শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবেই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। রেনেসাঁস শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। ফরাসি ঐতিহাসিক Michelet ‘রেনেসাঁ’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন পুনর্জন্ম বা rebirth হিসাবে। প্রাচীন গ্রিসের যেসব জ্ঞান ও শিল্প ধ্বংস হয়েছিল, তার পুনর্জন্ম। ইতালিয়ান rainasoita শব্দটির অর্থ revival of classied style of Architecture, অবশ্য এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় rediscovery of classical culture in all its aspects. ১৪ ইউরোপে রেনেসাঁ বলতে এই অর্থেই ব্যবহৃত হত। ‘The current age of litirary and artistic revival of the splendour of classical civilization pryare to the 5th century Barbarian imasion.”

ইউরোপের রেনেসাঁসের সময়ে ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য শিল্প ও জীবনের অনুসন্ধান এবং মূল্য নিরূপণ আরম্ভ হয়েছিল।

নবজাগরণ বা ‘নবজন্ম’ যখন শুরু হয় তখন তা কোন এক বিশেষ দিক থেকে আসে না, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তা পরিব্যাপ্ত হয়। এই জাগরণ মানুষের ভাবনা, চিন্তা ও চেতনা সর্বস্তরে প্রকটিত হয়ে আধুনিক জগতের দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ধর্ম সংস্কৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জীবিতা থেকে প্রবল উৎসাহে ও উদ্দীপনায় মানুষ নতুন যুগের আলোকিত পথে যাত্রা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণও এমন একটি রেনেসাঁস। অবশ্য প্রত্যেক দেশের চিন্তা চেতনার রূপানুসারে নবজাগরণের গতি ও প্রকৃতির স্বরূপ বিভিন্ন। বাংলার নবজাগরণও একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির গতিপথ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পশ্চাতে ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শের পুনরুত্থান ঘটিয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছিল বলেই বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণ দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে জাতীয় চেতনা সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপের রেনেসাঁসের তুলনায় বাংলার নবজাগরণের মধ্যে ভাবাদর্শের প্রভাব বেশি পরিমাণে ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় সংস্পর্শে আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল সন্দেহ নাই কিন্তু পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তাধারার প্রভাব এই নবজাগরণের ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় ছিল। সেজন্য বাংলার নবজাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিকাশ থাকলেও ভাবাদর্শের প্রাবল্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে এই ভাবোন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবোন্মাদনার প্রাবল্যের জন্যই হিউম্যানিজম এই দেশে রূপে রূপে জাতীয় চেতন্যমানসে একটি বিশেষ প্রেরণার উৎস রূপে জাতিকে নবযুগের প্রাণ-রূপসমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্যের অফুরন্ত বিকাশনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রতীচ্যের ন্যায় এখানে হিউম্যানিজম যান্ত্রিকতা, যুক্তিবিজ্ঞান এবং ভোগবাদের প্রাবল্যে বিনষ্ট হয়নি। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের মধ্যে ভক্তির সঙ্গে যুক্তি, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতা, ধর্মের সঙ্গে কর্মের অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছিল বলেই বাংলার নবজাগরণ সার্থক এবং শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেই এই সত্যটি প্রমাণিত

হবে।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সেই সময়ে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব জাতীয় জীবনে বহন করে এনেছিল। নব্যবিজ্ঞান মানুষকে শতাব্দীর অন্ধ জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এক নতুন জগতের সন্ধান দিল। ইতালিয় রেনেসাঁসের একটি ঘরে বাইরে দুই প্রধান পুরুষ চরিত্র। দুটিই দুটো পরস্পর বিরোধী চিন্তা ধারার প্রতীক। সন্দীপ আর নিখিলেশ। নিখিলেশের চরিত্রের দুর্বোধ্য অংশ ও আদর্শবাদের অবিশ্বাস্য প্রেরণার উৎস বোঝাবার জন্যই বোধহয় মাস্টার মশায়ের চরিত্রের সৃষ্টি। নিখিলেশ ঘরবাসী প্রনয়ী। খানিকটা নিষ্ক্রিয় জীবনের বহু ঝাটে আমার পথ আর সরল নেই। এ হচ্ছে নিখিলেশ। আর সন্দীপের আছে উদ্যম, কর্মে স্পৃহা এবং জীবন যেন তার বেগবান জীবন্ত। সন্দীপের এই

আবেগ জনিত উচ্ছাস রবীন্দ্র নাথ প্রত্যক্ষ করেছেন স্বদেশী যুগে। স্বদেশী যুগে উদ্দীপনাকে যখন উন্মাদনা গ্রাস করে নিল, যুক্তি ও বিশ্বাসের পরিধি যখন অধ আবেগ তাড়িত সীমা রেখায় বাঁধা পড়ল তখনই ঘটল পদস্থলন, হলো চরিত্র তুষ্ট। তখন রবীন্দ্র নাথ সন্দীপদের চরিত্রে লোভ রিপূর প্রকাশ দেখেছেন।

নিখিলেশের গৌরবময় সংসারে স্বদেশীর ঢেউ কি ভাবে প্রবেশ করল তারই পটভূমি হচ্ছে এই উপন্যাস। নির্লিপ্ত নিখিলেশের বিশাল প্রাসাদে সন্দীপ রূপ স্বদেশী ঢেউ এর প্রবেশ। সন্দীপের বিমলা কে নিয়ে ভাবনা “যে ছিল ঘরের প্রদীপ তাকে দেওয়ালির উৎসবে বাইরে টেনে আনার উদ্যোগ করতে শুরু করল”। আর বিমলা অভিভূত। নিখিলেশ অনুভব করছিল * বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ বাট জুড়ে গোরু টার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে কিন্তু আঘামের নয়, কাশ্চিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে।*

কিন্তু বিমলার জীবনে সেদিনের উদ্দীপনাময় স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে অগ্নি জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কোন অন্তপুর বাসিনী নারী এই উদ্দীপনার প্রতি মমত্ত্ব পূর্ণ আবেগ দেখিয়েছিল বিমলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সন্দীপের স্বদেশী ঢেউ এ সেও মোহিত। বিমলার কথায় “সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলা দেশের চিত্র যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারিনে। ষাট হাজার সগর সন্তানের ছাইয়ের পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করবে। কত যুগ যুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়েছিল কোনো আগুনের তাপ জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না, সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল, বলল এই যে আমি।” বিমলা নিজেই নিখিলেশের অভিব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করেছে “মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে অর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায়। কেবল দেখবার জন্য যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই তাকে ঘরের মধ্যে নিম্নয়ণ করে বসাবার কোনো আয়োজন। ঘরে বাইরে রবীন্দ্র নাথের রাষ্ট্রীয় অনুভূতির মানসিক ফসল। রবীন্দ্র নাথ মনে স্নতেন, “দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিস্ময়। মানুষ যদি প্রশাশমান হয়, তবেই দেশ প্রসাশিত। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী। তাই দেশ নিজের সন্তা প্রমানেরই খাতিরে অহরহ তাপিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা শেনো সাধনায় সার্থক। তারা না খালেও গাছ পালা জীব জন্তু জমায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আজন্ম ধাপে মরু বালু চলে ভূমির মতো। আমাদের গ্রহণ স্নার দ্বারা দেশ যদি সোনো ভাবে নিজেকে লাভ সরে না খাবে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন।” প্রাণ্ড সবি এই স্বা বলেছিলেন সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে “লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে।

তাই রবীন্দ্র নাথ উৎসস্ট স্বাদেশিকতাকে গ্রহণ স্নতে পারেন নি। পারেন নি মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যা কিছু করা হবে তাই হচ্ছে ধর্ম এই ভাবনাকে। রবীন্দ্র নাথ পিয়রসনকে চিঠিতে বলছেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৮) “ প্রেমের অংশর আমার জন্য নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি আমার ঘর খুঁজে পাব, এই প্রশান্ত আশা আমার কাছে।”

রাজনীতিকে পটভূমি করে ব্যক্তি মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রেমের ত্রিভুজ রচনার চেষ্টা বাংলা উপন্যাসে প্রথম 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। আর বিমলার মধ্য দিয়ে মানবমনের অন্তর্গত প্রবৃত্তির ও অন্যান্য প্রবণতাগুলির নির্বাধ বিকাশচিত্র এখানে রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'প্রেম' বিষয়ে তাঁর কবিতার মধ্যে কিংবা মালিনী, বিসর্জন ও রাজা নাটকের মধ্যে যে platonic বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন এখানে কিন্তু তার ইঙ্গিত একেবারে শেষে বোধহয় কিছুটা আছে, কিন্তু তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। বিষয়টি লক্ষণীয়। প্রেমের ত্রিভুজ রচনা করে সমস্যা-আরোপের পরিচয় রবীন্দ্র-উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ। এ জাতীয় আধুনিকতা তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে বেশি করে চোখে পড়ে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইউরোপ যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁর কাঁচা হাতে 'দান্তে পেন্সারকা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেখানেই আমরা প্রথম ত্রিভুজ সমস্যার পরিচয় পেলাম। এ সমস্যার ইঙ্গিত ও আলাপণ 'চোখের বালি'-তে আছে, আর এর বিকাশ ঘটেছে রীতিমতো সমাজপটভূমিতে 'ঘরে-বাইরে'-র মধ্যে। নারী স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এ উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রচনাভঙ্গির দিক থেকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথ অবলম্বন করা হয়েছে এখানে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস রচনার সময়ে দামিনী চরিত্রে অন্তর্গততার পরিচয় সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'-তে রূপকচিত্র লক্ষণীয়। রূপক বা allegory প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রমথ চৌধুরী এই বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জর্জ এলিয়ট এবং মেরিডিথ-এর উপন্যাসের প্রিয় পাঠক ছিলেন। মেরিডিথের প্রেরণা 'ঘরে-বাইরে'-তে লক্ষণীয়। ঐ উপন্যাসিকার "ডায়না অব দি ক্রশওয়ে" উপন্যাসকে অবলম্বন করে রাজনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মনস্তত্ত্বের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে। একথা স্পষ্টভাবে বলার জন্য দ্বিধা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা মিল খুঁজে পাচ্ছি এবং এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যরূপে প্রসঙ্গটির অবতারণা ও অস্বাভাবিক হবে না। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের অন্য বিশেষত্ব হল এর 'টেক্সটিকাল' রীতি বৈচিত্র্যের পরিচয় 'চতুরঙ্গ'-তে আছে, আরো সুন্দরভাবে দেখা গেল এখানে। 'ঘরে-বাইরে' আত্মকথনরীতিতে লেখা। বঙ্কিমের 'রজনী'-তে এর সূচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই রীতি আনলেন 'ঘরে-বাইরে'-র ক্ষেত্রে। উইল্কিন্স কলিন্স-এর woman in white থেকে রীতিটি বাংলাসাহিত্যে এসেছিল। 'ঘরে-বাইরে'-র চরিত্রগুলির আলম্বন তাদের চিন্তার স্রোত, 'চৈতন্য স্রোত'। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের এই আধুনিক রীতি 'ঘরে-বাইরে'-তে লক্ষণীয়। এই রীতির সূচনা হ'ল ইংরেজী সাহিত্যে ১৯১০ সালে ডরোথি রিচার্ডসন এর বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' লিখলেন ১৯১৬ সালে।

চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ঘরে-বাইরে-র idea বা আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন। 'চোখের বালি'-তে যে মনস্তত্ত্বের পরিচয় তাতে সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়নি। আর ঘরে-বাইরে-র রাজনৈতিক অভিক্ষেপ দেশের তৎকালীন চরম ও নরমপন্থীদের বক্তব্যের সমালোচনার পরিচায়করূপে প্রতিভাত হয়। বিমলার প্রেমিক মনকে কবি ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন এবং বাইরের ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়ে

অবশেষে যে প্রেমকে স্থায়ী করলেন তা কেবল একটি নারীর বিশিষ্ট প্রেমচেতনা নয়, তা হ'ল মানবপ্রেম। এমন শিল্পরীতি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসে বিরল দৃষ্ট। চার-অধ্যায়েও এমনটি দেখা যায় না, যদিও তার পটভূমিকায় আছে রাজনীতি এবং বক্তব্যে আছে প্রেমের পরিচয়। ঘরে-বাইরে একদিক থেকে যুগপরিচয়কে ফুটিয়েছে সাহিত্যে যা আধুনিক রীতির পরিচয় বহন করে। আবার অন্যদিক থেকে উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাষ্য। এখানে নিখিলেশ, রবীন্দ্রনাথের কথাই ব্যক্ত করছে। ঘরে-বাইরে আর এক দিক থেকে প্রেম-সমস্যার পরিচয় তুলে ধরে, যেখানে মনস্তাত্ত্বিক বিশেষত্ব আধুনিক বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। কাজেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারায় ঘরে-বাইরে অনন্য। এ উপন্যাসের সুর করুণরসাত্মক এবং উপসংহার শিল্পসম্মত। সামগ্রিকভাবে এ উপন্যাসের বিষয় একটি 'আইডিয়া', যার পরিচয় মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্মুখীনতা বা Psychological inwardness-কে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। এ উপন্যাস মানব-মনের অন্তর্গত প্রবৃত্তি-প্রবণতার বিকাশ ঘটিয়েছে। স্বাভাবিক ন্যায়নীতির (naturalistic morality) পরিচয়ও আছে এখানে। মানবের মগ্ন-চৈতন্যের বিপুল রহস্য উদঘাটনের জন্য কবি যথার্থভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথ গ্রহণ করলেন এ উপন্যাসে। আর আমরা, পাঠকেরা বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দ বা intellectual pleasure লাভ করলাম 'ঘরে বাইরে' পাঠসাপ্ত করে।

বঙ্গভঙ্গ যুদ্ধে সমস্ত দেশবাসী ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন। O' Malley লিখেছেন, "the partition was both anti-British and revolutionary in character"। এ সময়ে হিন্দুমেলা, রাথীবন্ধন, বন্দেমাতরম প্রভৃতি বিশিষ্ট বিষয় উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ও "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটির মধ্য দিয়ে দেশবাসীর নিষ্ঠার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১২ সাল পর্যন্ত যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল সে ধারায় কবির বিশেষ সায় ছিল না। কারণ তাঁর কাছে আন্দোলন-পর্যায়ের অনেক ব্যাপারই 'মেকি' বলে মনে হয়েছিল। তাই লেখক 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটির মধ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের যে চিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে কোথাও কোন অতিকৃতি নেই, কোথাও কল্পনাশ্রয়ী মিথ্যার প্রতিফলনও নেই। এক্ষেত্রে উপন্যাসটি একান্ত নিরপেক্ষ না হ'লেও সমসাময়িক রাজনৈতিক চিত্রের বিশ্লেষণাত্মক ভাষ্য। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের ভিন্নমুখী তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের দুটি দিকের বক্তব্যই বেশ পরিস্ফুট হ'য়েছে। বিশেষ করে বুঝতে পারছি রবীন্দ্রনাথের মতামত। জাতির ওপর, দেশের ওপর শাস্ত্রত ধর্ম বলে যে কিছু আছে, একথা রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। স্বাভাবিকতা বোধ ও জাতীয় সম্মানবোধ যদি শাস্ত্রত ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে তবে তার দ্বারা স্থায়ীকল্যাণ ব্যাহত হয়। সমালোচনার নিক্তিতে কবির এই ধর্মবোধকে যাচাই করে কোন ফল হবে না। চিন্তায় ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ Nationalism ও patriotism-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদবিরোধী মনোভাবের কথা রবীন্দ্রনাথের বিদিত। তাঁর 'ন্যাশনালিজম' নামক গ্রন্থে সংকলিত বক্তৃতাবলীর পূর্বেই 'ঘরে-বাইরে' রচিত হয়েছিল।

'ঘরে-বাইরে'-র নিখিলেশ ও তার বাল্যশিক্ষক চন্দ্রনাথবাবুর মধ্য দিয়ে স্বদেশিকতার যে আদর্শ প্রচারিত হ'য়েছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শের মিল সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে চন্দ্রনাথবাবুর উক্তি স্মরণীয়- "দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু। তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে আগায় জল দিতে চায়।" 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রাজনৈতিক কর্মসূচী যা আছে তার মূল কথা, উত্তেজনা মূলক হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মনুষ্যত্বের উদ্বোধক গঠনমূলক কার্যাবলীর সমর্থন, উগ্র জাতীয়তাবোধের বিরোধিতা, এবং

শাস্ত্রত মানবতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ণতামুক্ত মৈত্রী ও প্রীতির বাণী প্রচার। এই রাজনৈতিক মতবাদ ‘গোরা’র মধ্যকার মতবাদের সম্প্রসারিত রূপ। সন্দীপের মধ্যে দিয়ে উগ্র চরমপন্থী তথা রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাবের প্রসার ঘটেছে। সেখানে আদর্শও কর্মপন্থার বিরোধ ছিল। লেখকের বঙ্কিমচন্দ্রসুলভ কুনীতি-বিরূপতার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের মত ও আদর্শবর্ণনায় কিছু নিরপেক্ষতার অভাব ঘটলেও ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে একটি বিশেষ যুগের রাজনৈতিক চিত্রপট কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি সত্ত্বেও বিশ্বস্ত স্পষ্টতায় উল্লিখিত হয়েছে। উপন্যাসটির রচনাকাল (১৯১৬) ও-এর কাহিনীর যুগপটভূমি খুব কাছাকাছি। একান্ত ‘সমসাময়িক ঘটনাকে এভাবে অবিকৃত রেখে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ এখনো। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধরের লেখনীস্পর্শে তা সম্ভব হয়েছে। আর এমনি পটভূমিকায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণ ঘটানো আরো উল্লেখযোগ্য কলাকৃতি। নিখিলেশের কাছে বিমলা কেবল তার বিবাহিতা পত্নী নয়, তার গৃহসামগ্রীর অংশবিশেষ ও নয়, সে এক অনন্য ব্যক্তিসত্তা। সে চেয়েছিল বিমলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম। ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে গৃহকর্ম সম্পাদন করার জন্য বিমলার অস্তিত্ব নিরর্থক। তাই বাইরের পরিবেশে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠুক, বিশ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বুঝুক প্রেমের মাধুর্য-এই ছিল নিখিলেশের আবেদন। ঘরের প্রদীপশিখা বাইরের সত্যের শক্তিতে না জ্বললে সে শিখার ঐশ্বর্য প্রতিভাত হ’বে না। তাই রবীন্দ্রমানসের আন্তরিকতা স্পর্শী সত্যসন্ধ নিখিলেশ ঘরের প্রদীপকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। নারীর স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য বাইরের আলোড়ন সহায়তা করেছে। বিমলা বাইরের অভিঘাতে চিনেছে মানুষকে, চিনেছে নিজেকে। তার আত্মপরিচয়ের উপলব্ধিতে উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। আর এমনিভাবেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার সমাপ্তির পর পাঠকমনে ফুটে উঠেছে সত্য মঙ্গল ও প্রেমের শাস্ত্রত শ্বেতকমল। তোর স্বদেশী শিল্প গড়ার ব্যর্থ প্রয়াসগুলি তারই অদ্রান্ত নিদর্শন।

(বিলিতি পণ্য বর্জন, পিকেটিং, বিলিতি বস্ত্র-দাহন, ইংরেজ বিদ্বেষ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, দাঙ্গা, স্বদেশী-ডাকাতি, জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা, দেশত্যাগী আলোড়ন, নারীদের মধ্যেও আন্দোলনের সাড়া প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনা ও চিত্রণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের বিশ্বস্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। বিলিতি বস্ত্র পোড়ানোর হুজুগে পঞ্চুর মতো সাধারণ ব্যবসায়ীর ওপর জুলুমের উদাহরণ সে যুগে বিরল নয়। হরিশ কুণ্ডুর মতো প্রজাপীড়ক ও চতুর ছদ্ম স্বদেশ প্রেমিক জমিদার চরিত্রটি একান্ত বাস্তব।

স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানরা যোগ দেননি, কারণ ইংরেজ বুঝিয়েছিল পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশ হলেও মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপিত হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও স্বদেশী আন্দোলনের পথে ছিল অন্তরায়। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে এ সবই বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণের উদাহরণ। সন্দীপের মহিষমর্দিনী পূজার আয়োজনও ছিল সাধারণের মোহ সঞ্চারের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। এ সবই ছিল রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শের বিরোধী।

নিখিলেশ আর তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবু রাজনৈতিক হীনতার বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব ও অন্তর্বেদনা ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে সন্দীপের আচার-আচরণে তাঁর বীতরাগটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আচার্য যদুনাথ সরকার স্পষ্টতই বলেছেন যে, সন্দীপের চরিত্রে কবি অরবিন্দের স্বদেশিকতাকে বিদ্রূপ করেছেন।

রাজনীতি এই উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি সন্দেহ নেই এবং চরিত্রের কিছু আনুষঙ্গিক পরিচয়ও তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বিমলার

মতো অন্তঃপুরিকাকেও নাড়া দিয়েছে। বিপ্লবী নেতার ভূমিকায় সন্দীপ তার সামনে এসেছে। বিমলা তাকে ব্যক্তিরূপে দেখেনি, দেখেছে মুক্তি সাধক রূপে। কিন্তু কখন তার প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ শুরু হয়েছে বিমলা নিজেও তা বুঝতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতা রূপেই সন্দীপ তাকে ভুলিয়েছে, আর বিমলাও সহজে তার ঘর-সংসারকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভূমিকার গুরুত্ব এইখানে।

কিন্তু এই উপন্যাস শুধু স্বাদেশিকতার উপন্যাস নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে তার ক্রিয়াকলাপ দেখতে হলেও তার মন ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বিশেষত নিক্সনের দর্শনে প্রভাবিত। বাংলাদেশে সে সময় এই মতবাদের প্রভাব তেমন ছিল না। আসলে সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জড়বাদ,

বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভোগোন্মত্ততাকে আক্রমণ করতে চেয়েছেন। বস্তুতান্ত্রিক বলেই প্রাণচঞ্চল সন্দীপের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো মূল্য নেই। ভোগকে সে অধিকার বলে মনে করে। স্বদেশীর মূল মন্ত্র যে স্বার্থত্যাগ তার বিন্দুমাত্রও তার নেই। সে স্বদেশীকে গ্রহণ করেছে ব্যক্তিগত লিপ্সার তাড়নায়। স্বদেশীর মোহময় মন্ত্র দিয়েই সে বিমলার মতো রমণীর মন জয় করেছে, অমূল্যর মতো ছেলেকে জয় করেছে। বিমলার প্রতি তার আকর্ষণ ইন্দ্রিয়জ আসক্তি, স্বদেশী তার উদ্দেশ্যসাধনের উপায়।

শেষপর্যন্ত সন্দীপের অর্থ গৃধুতা দেখে ও অমূল্যের সংস্পর্শে এসে বিমলা সন্দীপের স্বরূপ জানতে পেরেছে এবং স্থিতধী চরিত্র নিখিলেশেরও সত্য পরিচয় উপলব্ধি করেছে। এইভাবে বিমলা ভয়ঙ্কর নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপন্যাসের পটভূমিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রকট হলেও ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস তবু নিছক রাজনৈতিক ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনকে বিদ্রূপ করা এই উপন্যাসের মৌল লক্ষণ নয়, বরং ‘চার অধ্যায়’-এ সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা অনেক বেশি গুরুত্ব নিহিত। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে রাজনীতির পটভূমিতে রচিত। (সন্দীপ একদিন বিমলার কাছে তাহার স্বদেশী কার্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইয়া বসিল। বিমলা তাহাকে না বলিতে পারিল না। কিন্তু এত টাকা কোথা হইতে দিবে? তাহার গয়না বিক্রয় করিয়া দিতে চাইল, সন্দীপ বলিল, সে হবে না, গয়না এখন হাতে রাখিতে হইবে, তোমার স্বামীর টাকা থেকে দাও। যখন দেশের প্রয়োজন হয়েছে, তখন এ টাকা নিখিলেশ দেশের কাছ থেকে চুরি ক রে রেখেছে। বন্দে মাতরং এই মন্ত্রে লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে। বল, বন্দে মাতরং-বিমলাও বলিল বন্দে মাতরং। কিন্তু সন্দীপ অবশেষে তাহার পঞ্চাশ হাজারের দাবী পাঁচ ৫,০ হাজারে কমাইয়া আনিল। মহিষমর্দিনীর পূজার জন্য এই টাকার এখনই দরকার। তাহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বিমলাই সেই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

কিন্তু সে এই পাঁচ হাজারও কোথায় পাইবে? তাহাদের শোবার ঘরের পাশে একটা ছোট কুঠরিতে লোহার সিন্দুকে নিখিল তাহার বড় ও মেজ ভায়ের বাৎসরিক প্রণামীর জন্য ছয় হাজার টাকা মজুত রাখিয়াছিল। বিমলা নিখিলের পকেট হইতে সেই লোহার সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই ছয় হাজার টাকার গিনি চুরি করিল এবং পরদিন তাহা সন্দীপের হাতে দিল। ইহাই বিমলার প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গীতি অথবা স্বদেশ-সেবা-ব্রতের দক্ষিণা।

এই কার্য করার পর বিমলার মনে ঘোর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। অমূল্য নামে সন্দীপের একটি চেলা ছিল, সে বিমলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। বিমলা তাহাকে নিজের গহনার বাক্স দিয়া বলিল,

যে রূপেই ইউক এই গয়না বিক্রয় করিয়া আমাকে ছয় হাজার টাকা কালই আনিয়া দিতা
স্বদেশীতা বিভিন্ন নিদর্শন ১। নিখিলেশ কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেশের প্রয়োজনের জিনিস
দেশে উৎপাদন চেষ্টা
২। আমাদের দেশে বড় কারবার যে সময় সম্ভবপর হয়না তা প্রদান কারণ আমাদের ব্যাংক নেই
ফলে ব্যাংকের ব্যবস্থা
৩। বিদেশি ওষুধ সিসি গুলো বর্জন
অপর দিকে সন্দীপ-“সে বলছে এই যে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী পাচার করে বেড়াচ্ছি ভেবে
দেখলুম এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে”
তারমধ্যে স্বার্থপরতা স্থূলতা কুটিলতা ছিল স্বদেশ সে কখনো বড় করে দেখেনি।